ছেলেবেলার স্মৃতি

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

প্রায় দেড়যুগ কি তার ও অধিককাল আগের কথা যখন আমি ছিলাম নিতান্ত ছোট ছেলে। বয়স বড়জোর ছয় কি সাত। সবেমাত্র বর্ণমালা আয়ত্বে আনার চেষ্টায় ব্যার্থ না হয়ে সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছি।

ছোট বেলা থেকেই আমি ছিলাম অস্থির এবং অশান্ত স্বভাবের আর ও বিদ্যমান ছিল কৌতুহলী মানষিকতা আর অজানাকে জানার এক অদম্য বাসনা। কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো গ্রামের বাইরে যাইনি। আমার চারপাশের জগতে বিশ্ব প্রকৃতির যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছি তা ছিল অতি সামান্য। দৈবাৎ কখনো যদি পাড়ার শেষ মাথায় যাবার সৌভাগ্য হত তখন দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভিন্ন গাঁয়ের আবছায়া আমার কচিমনে যখন ভেসে উঠত তখন আমার এ মনে নানাবিধ প্রশ্ন বারবার দোলা দিত। নদীর এ পার যেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাবে ও পারেই সর্বসুখ সে রিক্ত–নিঃস্ব–শুন্য আমার ক্ষেত্রে ও তার ব্যাতিক্রম ঘটত না। মনে হত দুরের ঐ গ্রাম গুলো কতই না সুমিষ্ট ফল দান করে বৃক্ষরাজী ধরণীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু কি বৃক্ষ? না জানি আমারই সমবয়সী সেখানকার আদম সন্তানেরা কত সুখে বসবাস করছে আর মজার-মজার খেলায় সমস্ত দিবস ব্যতিব্যাস্ত থেকে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে তৃপ্তীর জীবন যাপন করছে। এ সমস্তভেবে দুরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভাবতাম – আহা! একবার যদি সমস্ত কিছু দেখার সৌভাগ্য হত তবে সমস্ত কিছু দেখে আমার এ আঁখি স্বার্থক করে তুলতাম।

আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল জাকির। ওর নানার বাড়ী ছিল মাইল খানেক দূরে রূপপুর গ্রামে। সমস্ত এলাকার মধ্যে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছিল সেই গ্রামে। বয়সে ও কিছুটা বড় ছিল বলে আমার পূর্বেই বিদ্যালয়ের স্বাক্ষাত পেয়েছে এবং সেই সূত্র মতে বার কতক সমস্ত গ্রাম ঘুরে-ফিরে দেখেছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ে গমনের পর থেকে ওর নানার বাড়ী আপন বাড়ীর মত ব্যাবহার করেছে। মাঝে-মাঝে জাকির যখন রূপপুর গ্রামের সৌন্দর্য আর বিদ্যালয়ে নিত্য ঘটে যাওয়া কাহিনী বর্ণনা করত তখন তা আমার কাছে রূপকথার গল্পের মতই মনে হত আর তথায় যাবার জন্য সদাই আমার মনটা ছটফট করত কিন্তু অত্যান্ত দুরন্ত বলে আমার সু-বিবেচক অভিভাবক কখনো সেখানে পাঠানোর কথা মনে ও আনতে পারতেন না। কিন্তু ছেলে যে আঁই বুড়ো হতে চলল ! এখন তো আর বসিয়ে রেখে লাভ নেই। পন্ডিত বানাতে হলে বিদ্যালয়ে ভর্তি আবশ্যক তা সে শান্তই হোক আর অশান্তই হোক। তাই একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন। অবশ্য আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম যে মাষ্টার মহোদয়ের বেতের বাড়ি দু' চারটি গায়ে পড়লে যত অবাধ্য ছেলেই হোক একেবারে বাধ্য

হয়ে যায়। নির্দ্দিষ্ট দিনে অভিভাবকসহ জাকির ও আমি বিদ্যালয়ের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমার আনন্দ যেন আর ধরে না ! পথের মধ্যে যার সাথেই দেখা হয়েছে, আনন্দে আপ্লুত হয়ে নাচতে নাচতে বলেছি আমি স্কুলে যাচ্ছি।

পশ্চিম পাড়ার শেষ মাথায় রাস্তার উপর একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় সেতু ছিল যার উপর দিয়ে অতি সাবধানে গরু-মহিষের গাড়ী একটি একটি করে যাতায়ত করত। ভাগ্যিস কখনো কলের গাড়ী উঠেনি ! যদি উঠত তবে নিজেদের উন্নয়নের জোয়ার দেখে নিজেরাই বিস্মিত হয়ে যেত। সেতুটির পরেই রাস্তার দু' ধারে সারি-সারি কলা গাছের ঝাড় যার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। আধা ঘন্টা হাঁটার পরই রূপপুর গ্রামে প্রবেশ করলাম যে গ্রামটি আমার কল্পনার মানসপটে নিঃসর্গরাজ্য হিসেবে ধরা দিয়েছে। সত্যিই গ্রামখানি অপূর্ব! সারি সারি গাছের অন্তরাল দিয়ে দু' চারটি ঘর চোখে পড়ছে। দু' একটাতে রাজকীয় বেশ অর্থাৎ টিনের ছাউনি তবে বেশির ভাগ ঘরের ছাউনিই ছনের। গ্রামের পাশ দিয়ে খল্‌সে ভাঙা নদী এঁকেবেঁকে চলেছে যেন কোন বাইজী কোমর বাঁকিয়ে নৃত্যরত। আলোকরশ্মি পড়লে বাইজীর চরণের নুপুর যেভাবে ঝল্‌সে উঠে ঠিক তেমনি শান্ত জলরাশির উপর সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত ভাবে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ঝল্‌সে উঠছে এবং তারই কোলে অপর একটি গ্রাম দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নদীর বক্ষমাঝে জলে ভাসন্ত জেলে নৌকাগুলো উত্তরী হিমেল হাওয়ার পাল খাটিয়ে এদিক ওদিক বিচরণ করছে।

বিদ্যালয়ে পৌঁছতে আর ও ক্ষণকাল বিলম্ব হল। ইতিমধ্যে বিপত্তি অবশ্য একটু ঘটেছে। বিদ্যালয়ে পৌঁছবার একটু আগে প্রায় বিদ্যালয় ঘেঁষে শিবু চৌকিদার নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাড়ী মাড়িয়ে তবে বিদ্যালয় যেতে হয়। পাশ ঘেঁষে আরও দু' চারটি হিন্দু পরিবারের চিহ্ন চোখে পড়ে। দেশ বিভাগ এবং একাত্তরে শত নির্যাতন সয়েও জন্মভুমিকে ভালোবেসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে এবং কাঁসের ঘন্টা বাজিয়ে ভগবানের স্মৃতি এ অঞ্চলে একমাত্র এরাই করে যাচ্ছে। সেই বাড়ীর আঙিনায় ঠাকুর ঘরের সামনে কোন এক স্বাধীনতা হরণকারী একটি কুকুর ছানার স্বাধীনতা হরণ করে নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে শক্তকরে বেঁধে রেখেছে। আমরা দু'জন অর্থাৎ জাকির ও আমি সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র ক্যাঁ... ক্যাঁ.... ক্যাঁ স্বরে কয়েকটা ডাক দিল। তার এ ডাক অভ্যর্থনা না কি আমাদেরকে ভীতির সাগরে নিক্ষেপ করার জন্য তা না বুঝেই অত্যান্ত দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলাম। সে ও আমার আদর পেয়ে মাথাটা নীচু করে কুঁ...কুঁ...কুঁ...স্বরে ডেকে একেবারে আমার পায়ের উপর শুয়ে পড়ল। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণী এ দৃশ্য দেখছিল। আধুনিক যুগের হলেও মন-মানসিকতায় ব্রাহ্মণী ছিলেন সেকেলে তা প্রথম দেখেই বোঝা গেল। সিথীতে টকটকে লাল সিঁদুর আর চেহারা খানা দেখে মনে হল এইমাত্র তিনি আহ্নিক সেরে উঠেছেন। আমি হাত বুলিয়ে দেওয়ামাত্র সম্মুখে ছুটে এসে হায়! হায়! করতে লাগলেন। মুসলমান ছেলের হাত পড়েছে এখন কি জাত রক্ষে আছে! এখন যে এটাকে গঙ্গার জলে না নাওয়ালেই নয়! তা কি গঙ্গা খিরকীর সম্মুখে - এখন কি করা যায়?

আকস্মাৎ হায়! হায়! শব্দ শুনে আমি কুকুর ছানাটিকে ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত উঠে দাঁড়িয়ে একবার কুকুর ছানাটির দিকে আর একবার ব্রাহ্মণীর দিকে চাইতে লাগলাম। চেয়ে

দেখলাম আকস্মাৎ এহেন ঘটনায় কুকুর ছানাটির ও ভয়ে বিহ্বল হয়ে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছে। সে চোখের চাহনি যে দেখেনি সে বুঝতে পারবেনা। সে যেন চোখের ভাষায় বলতে চাচ্ছে " বন্ধু এ বন্দীদশা আমার কাম্য নয়, আমি ও তোমারই মত স্বাধীনতার অনাবিল সুখ-স্বর্গে ভেসে যেতে চাই, আমায় মুক্ত করে নিয়ে চল, বন্ধু এভাবে একা ফেলে যেও না, তার এ করুণ চাহনী আমি সইতে পারলাম না। তাই পুণরায় তাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে যাব।

ব্রাহ্মণীর এতে কোন দ্বি-মত ছিল না কারণ মুসলমানের ছেলের হাতের স্পর্শ পাওয়া কুকুর ছানাটিকে ঠাকুর ঘরেরর সামনে বেঁধে রেখে ঠাকুরের চরম অবমাননা করতে তিনি চাইলেন না। তাছাড়া এহেন তুচ্ছ কুকুর ছানাটির জন্য কেউ কি নরকে যেতে চায়! তাই বিসর্জন দেওয়াই যুক্তি-সিদ্ধ মনে করলেন কিন্তু বাধ সাধল ব্রাহ্মণীর ছোট ছেলে পাঁচু। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে কুকুর ছানাটির যে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে তা ধরে বসে রইল। আমিও হারবার পাত্র নই তাই ওকে পরাজিত করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করলাম শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। যখন কিছুতেই কিছু হলনা তখন আশার সম্বল হয়ে দাঁড়াল ধর্ম। ব্রাহ্মণী পাঁচুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন –

– পাঁচু, কুকুর ছানাটিকে ছেড়ে দে বাবা।

– না মা, আমি এটা নিয়ে যেতে দেব না।

– ওটা যে ও ছুঁয়ে দিয়েছে।

– ছুঁয়ে দিলে কি হয় মা?

– পাগল ছেলে, ছুঁয়ে দিলে জাত যায় যে!

– জাত গেলে কি হয় মা?

– জাত গেলে আর থাকে কিরে! জাতই সব। তাছাড়া জাত গেলে নরকে যেতে হয়।

নরকে যাবার কথা শুনে পাঁচুর জ্বলে উঠা জেদী মনের রিদিম এক নিমেষে ধপ করে নিভে গেল। ভয়ে মুখটা শুকিয়ে বিবর্ণ আকার ধারণ করল। এক নিমেষে কুকুর ছানাটির দড়ি ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে সে স্থানে আব্বু পৌঁছে গেছেন। আব্বুকে দেখেই ব্রাহ্মণী দুই হাত জড়ো করে বলে উঠলেন–

– নমস্কার দাদা ছেলেটি কি আপনার?

– হ্যাঁ, কেন দিদি?

– না, এমনিতেই।

– ও বুঝতে পেরেছি। কুকুর ছানাটিকে নিয়ে যেতে চায়। তা ওর ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

– তা নিয়ে যাক্ না। শম্ভু দার গোয়াল ঘরে আরও দু'টো আছে। ওখান থেকে পাঁচুকে একটি এনে দেব। শেষকালে জয় আমারই হল এবং আমি দড়ি সমেত কুকুর ছানাটিকে নিয়ে পুণরায় বিদ্যালয়ের পানে হাঁটতে লাগলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

বিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করামাত্র দৃষ্টি পড়ল নদীর কূলে দন্ডায়মান পুরণো বটবৃক্ষতলে। সেখানে দেখলাম হাতে খড়িমাটি ধারণ করে সক্রেটিসের উত্তরসূরী একনিষ্টমনে কালো বোর্ডে কি যেন লিখে যাচ্ছেন আর আমরই সমবয়সী শিক্ষার্থীর দল নিবিষ্ট চিত্তে গলাধঃ করণ করে যাচ্ছে। তাদের করেও করেও অরুচী ধরে গেছে বলে একে ওপরের গায়ে চিম্‌টি কেটে মাথায় টোকা মেরে গলাধঃকরণ করতে যে চায়না তা প্রকাশ করছে এবং এদিক-ওদিক উঁকিঝুকি মারছে কখন খাদ্যাভাস পরিবর্তন হবে অর্থাৎ ছুটি হবে এই আশায় কিন্তু অত্যান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে চিৎকার চেঁচামেচীর কোন লক্ষনই নেই। আরও মিনিট খানেক পরে আমরা বটবৃক্ষতলে হাজির হলাম। একে একে সমস্ত ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি দৃষ্টি নিবন্ধিত হল আমাদের দিকে। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ শেষে সকলেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আমার হাতে ধরা কুকুর ছানাটির দিকে। শিক্ষাগুরুর দৃষ্টি তখনও পড়েনি। তিনি বোর্ডে লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন– বাবুল উঠে দাঁড়া দেখি, তিন যোগ দুই কত হয়? বাবলুর মুখে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে পেছনের দিকে তাকালেন আর আব্বুকে দেখেই ভূত দেখার মত একেবারে চম্‌কে উঠলেন। তারপর খড়িমাটি রেখে দিয়ে আমাদের সামনে এসে আম্‌তা আম্‌তা করে বলতে লাগলেন।

খন্দকার সাহেব যে! তা কি মনে করে পদধূলি দিতে আসলেন। ওরে বাবলু–ডাবলু একটা চেয়ার নিয়ে আয়না বাবা! না তোরা সব...। থাক্ থাক্ মাষ্টার সাহেব আর ব্যাস্ত হবেন না। এই আমার ছোট ছেলে। ওকে ভর্তি করাতে আনলাম। – তা এনেছেন ভালই করেছেন আরও একটা সদস্য বাড়ল। আব্বু আমাকে ভর্তি করিয়ে স্কুলে রেখে চলে গেলেন এবং সেই সাথে স্যার ও পাঠদানে ইতি টেনে অফিসরুমের দিকে চলে গেলেন। স্যার অফিসরুমে প্রবেশ করার কিছুক্ষন পরই বিরতির ঘন্টাধ্বনী বেজে উঠল আর সংঙ্গে সংঙ্গে হৈ....হৈ....রৈ.....রৈ... শব্দে সমস্ত বিদ্যালয় মাঠে প্রবহমান বায়ুমন্ডলে প্রতিধ্বণী সৃষ্টি হয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরের দিকে ছুটে চলল। যুদ্ধবন্দী মানুষগুলো ও বোধহয় স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দে এতটা আনন্দিত হয়না। আমি হতবিহ্বলের ন্যায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ দেখি জাকির এবং আরও দু' তিনজন আমারই সমবয়সী আমার দিকে এগিয়ে এল এবং বলল–

– চল্ শুভ।

– কোথায়?

– ঐ ঝাড়ের মধ্যে। মধু খেতে যাব-যাবি?

– কিন্তু স্যার যদি....।

– কিছু বলবেনা, এখন টিফিন তো।

স্যার কিছু বলুক না বলুক আর নাই বলুক তাতে কিছু আসে-যায় না। মধুর কথা শুনলে রসনাবোধ জেগে উঠেনা এমন বে-রসনাবোধ মানুষ এ সংসারে খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু কি মানুষ? পতংগ পর্যন্ত যার লোভে পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায় এবং গুন গুন করে গান গেয়ে ফুলের রাণী হতে শুরু করে মেথরনীর পর্যন্ত মন হরণ করে মধুর স্বাদ গ্রহন করে অত্যান্ত তৃপ্তীবোধ করে এবং পাছে মধুর ঘাটতি হয় সে জন্য ভবিষ্যতের জন্য মৌচাক সঞ্চয় করে রাখে। বাবা মধু, তোমার যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় থাকত তবে জিজ্ঞাসা করতাম তুমি পুষ্টিকর

এবং উপাদেয় বটে কিন্তু আর কোন্ কোন্ তোমার মাঝে বিদ্যমান যার জন্য বিশ্ব সংসারে তোমার এত পরিচিতি? সামনে তোমার ঐ দু' অক্ষরযুক্ত নাম যুক্ত হলেই উপসর্গের বদল ঘটে বিশ্রী-সুশ্রী হয়ে যায়? এমন গুন সম্পন্ন মধুর কথা শুনে আর তা হাতের নাগালে থাকা সত্বেও তার সংস্পর্শে না যাওয়ার মত এমন বোকা কি আর এ বিশ্ব সংসারে আছে? তাই প্রতিউত্তরে চল্ বলেই সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

বিদ্যালয় ঘেঁষেই দক্ষিণদিকে ঘন বিস্তীর্ণ জংগল। অবশ্য জংগলে বড় তরুশাখার সন্ধান মেলা ভার। ক্ষুদ্র গুল্ম জাতীয় বৃক্ষের প্রাধান্যই বেশি তবে রাজার গর্বে দাঁড়িয়ে আছে কিছু খেজুর গাছ আর নাম না জানা দু' চারটি বৃক্ষ। বড় জন্তু জানোয়ারের আশা নেই তবুও ভেতরে যেতে বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল। তাই সামনের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে পুণরায় কিছুটা পিছিয়ে এসে বললাম।

– মৌমাছিকে আমার বড্ড ভয় হয়, আমি যাব না।

– মৌমাছি কোথায় রে....?

– তাহলে মধু...?

– মৌমাছি ছাড়া কি মধু হয় না?

– গুল মারিস্ না, আমি জানি না ভেবেছিস্?

– ঠিক্ আছে, মৌমাছি ছাড়াই তোকে মধু খাওয়াব, চল্ ভেতরে চল্।

– না আমি যাবোনা।

– ঠিক্ আছে তুই থাক্ ।

যাক্ বাবা বাঁচা গেল বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কুঁচকে যাওয়া বুকের পাটা সম্প্রসারিত হয়ে সাবেক অবস্থায় পৌঁছল। ধীরে ধীরে চোখ তুলে নদীর ও পারে চাইলাম। ওপারে দৃষ্টি পড়ামাত্র প্রথমবারের চেয়ে বুকের পাটা আরও কুঞ্চিত হয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। হৃদপিন্ডের টিপ্‌টিপ্ গতি স্বাভাবিকের চেয়ে এত দ্রুত বেড়ে গেল মনে হল যেন কোন অদৃশ্য শক্তি হাতুরি পিটিয়ে গতি বাড়িয়েই চল্‌ছে। অনেক চেষ্টা করলাম বাধ্য করার কিন্তু অবাধ্য বালকের মত দ্বি-গুন অবাধ্য হয়ে গতি বেড়েই চলল। ওপারে ঘন বাঁশ বনের বাইরে বাইরে দু' একটি নতুন পুরণো কবরের বাঁশের বেড়া দেখা যায়। বাঁশের ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে ভেতরে দৃষ্টিপাত করার মত দর্শন শক্তি নেই, কারণ লতাপাতা জড়াজড়ি করে ভেতরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে আমাবশ্যার অন্ধকার কোন ছায়! ভেতরের পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে তা কোন প্রেতাত্মার রাজবাড়ী। ঐ রাজবাড়ীতেই বুঝি নরমুন্ডু খেকো রাক্ষস দিনের ঘুম শেষে রাতের বেলা নরমুন্ডুর সন্ধানে বের হয়। শুনেছি মধ্যাহ্নে এরা নাস্তার সন্ধানে বের হয়। ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম সূর্য মধ্য গগনে এসে উঁকি মারছে। এই বুঝি সময়! হয়তো এক্ষুণি বের হয়ে আসবে বীভৎস কংকালমূর্তি আর আমার ঘাড়টা মটকে তাজা রক্ত খেয়ে উদর পূর্তি করে পরম স্বস্তিতে পুণরায় রাজবাড়ীতে ফিরে গিয়ে সুখের নিদ্রা যাবে। কেন যে ওদের সাথে গেলাম না? এখন বুঝি প্রাণটাই যায়। – শুভ.....।

চম্‌কে উঠে পেছনে তাকাতেই দেখি জাকির সংগীসহ হাতে সাদা ফুল সমেত কিছু ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। – কি রে তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? ভয় পেয়েছিস্ বুঝি? – কই না তো। ভয় পাবো কেন? মধু এনেছিস্ ? – মধু? এই নে....। জাকির ফুল সমেত ডাল কয়েকটি আমার সামনে মেলে ধরে বলে উঠল– এই যে দেখছিস্ শুভ, এই গাছগুলোর পাতা মধুর চেয়ে মিষ্টি, চোখ বন্ধকরে একটি পাতা চিবিয়ে গিলে ফেল দেখবি কি মিষ্টি! – সত্যি! কই দে দেখি একটা খেয়ে দেখি? – হায় আল্লাহ্ ! পাতা চিবিয়ে গিলে ফেলা তো দূরের কথা মধুর স্বাদ এমন যে তা যত দ্রুত সম্ভব মুখ থেকে ফেলে দিতে পারলেই জিহ্বাটা বাঁচে। ওয়াক.....থু....থু.....বলে পাতাসহ একরাশ থু থু বাইরে ফেলে দিলাম। – কি রে ফেলে দিলি যে! – ফেলে দেব না তো গিলে ফেলব? মিথুক কোথাকার মধু কি কখনো তিতা হয়? বিপদের আশংকা দেখে জাকির হাঁটু গেড়ে হাতদুটি একত্রিত করে ক্ষমা চাইল। তারপর সাদা ফুল একটি একটি করে চুষতে লাগল এবং আমাকে ও চুষতে বলল। আমি ভয়ে ভয়ে একটি ফুল চুষেই বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যিই ফুলের মাঝে যে রসটুকু ছিল তা মধুর মতই মিষ্টি। চুষতে চুষতে পুণরায় বিদ্যালয়ে ফিরে এলাম এবং প্রায় সংঙ্গে সঙ্গেই ঘন্টাধ্বণী বেজে উঠল। আরও ঘন্টাখানেক পরে ক্লাস শেষে বিদ্যালয় ছুটি হলে কুকুর ছানাটিকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ছোটবেলায় প্রথম বর্ণমালা আয়ত্বে আনার স্মৃতিময় ক্ষণগুলো প্রত্যেকটি বর্ণমালা ব্যাবহারীর মুক্তার মত জ্বল জ্বল করে উঠে। আর যারা এ বর্ণমালা নব শিক্ষার্থীদের মগজের মাঝখানে চির সমুজ্জল ভাবে সাজিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর তাদের চেষ্টা কি কম? অবাধ্য বালক-বালিকারা যখন কিছুতেই তা আয়ত্বে আনতে চায়না তখন তারা আ-তে আনারসের মত রসের রসের কথা বলে এবং শত প্রলোভনে প্রলোভিত করে তাদের বাধ্য করতে চেষ্টায় ত্রুটি কম করেন না। আদিগ্রামে আমাদের জন্ম বলে শত রকমের খেলনার সাথে তখন ও পরিচিত হইনি বা কেউ আমাদের এমন প্রলোভনে প্রলোভিত করেনি তবে মুছা দাদার দোকানের তিলের খাজার সন্ধান যারা পেয়েছে সেই সমস্ত ভোজন বিলাসী শিক্ষার্থীদের সামনে কেই যদি সেই তিলের খাজার চিত্র তুলে ধরত তখন অবাধ্য বাধ্য হয়ে যেত এবং অ-আ ধ্বণীগুলো মস্তিষ্ক ধারণ করুক আর নাই করুক মুখে এত জোরে উচ্চারণ করত যে মনে হত সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের অনু-পরমানুতে তারই প্রতিধ্বনী সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমস্ত প্রকৃতি ও তাদের সাথে সাথে জ্ঞান সাধনায় ব্যাস্ত।

আমি যদিও সেই তিলের খাজার সন্ধান তখনও পাইনি। তবে চিড়া-মুড়ি আর খেজুর গুড়ের পাটালির স্বাদ পেয়েছিলাম আমার মাড়ীতে শক্ত দুধাল দাঁত গজানোর পর হতেই। সে কি তৃপ্তি! এখনও তা মুখে লেগে আছে। কিন্তু একা একা সেই রসনার স্বাদ ক্যামন যেন খাপছাড়া লাগত তাই একজন সঙ্গী খুঁজতাম। সঙ্গীর সাথে এমন তৃপ্তী ভাগ করে নেবার মাঝে আরও একধরনের তৃপ্তী। কিন্তু কাকে পাব? জাকির! সে তো নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশের বৈধ লাইসেন্স পেয়েছে কিন্তু আমি এতটাকাল ধরে ও পাইনি। ভাবলাম বিদ্যালয়ে যেহেতু প্রবেশ করেছি

এখন পেলেও পেতে পারি তাই হাতে খেজুর পাটি আর চিড়া-মুড়ির ডালা নিয়ে নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশের জন্য হাঁটতে লাগলাম।

আমাদের বাড়ীটা ছিল নালার ধারে। অবশ্য গ্রাম্য ভাষায় সেটাকে বলত "জোলা"। খলিশা ভাঙা নদী তার বক্ষমাঝের অশান্ত জলের ঢেউ ধরে রাখতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছে বলে একদিকে সরু শাখার ন্যায় সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে যেমনিভাবে আঁখি হতে অশ্রু ঝরার পর মুখ অবয়বে অশ্রুর রেখা দেখা যায়। শীতের শেষের দিকটায় এসে খলিশা ভাঙা নদীর বক্ষমাঝের অগাধ জলের যখন কিছুটা ঘাটতি পড়ত তখন অপরকে যে জলটুকু দান করেছিল তা টেনে নিত। অপরের ঋন শোধ করে দেবার পর নালার বুকে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত অর্থাৎ নালার বুক শুকিয়ে ফেটে যেত। সেই ফেটে যাওয়া অসমান বক্ষকে নব শিক্ষার্থীদের দল অপটু হাতে সমান করে বিদ্যা শিক্ষার একটি ক্ষেত্র তৈরি করত। এ দলের সর্দারিণী ছিলেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া "বেবী আপু" পূর্ব গগনে সূর্যি মামা যখন একটু একটু করে সারি সারি গাছের অন্তরাল দিয়ে উঁকি মারত তখন বই খাতা হাতে নিয়ে বেবী আপুর সৈন্য-সামন্ত একে একে এসে হাজির হত। প্রধান সেনাপতি এসে যখন উপস্থিত হতেন তখন সৈন্য-সামন্তগুলি ত্বড়িৎ গতিতে মাদুর বিছিয়ে ক–তে কাকা, ম-তে মামা এমনি গগনবিদারী চিৎকারে চারিদিকটা মুখরিত করে রাখত। সূর্যি মামা তার এই বোন পো এবং বোন ঝি দের শীতল মগজে একটু একটু করে উষ্ণতা ঢেলে দিত, আর চিৎকারের মাত্রা একটু একটু করে বাড়তে থাকত। সূর্যি মামার তেজ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর জ্ঞান অন্বেষণকারীদের মগজের তেজ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এমনি করে বেবী আপুর কঠোর তত্বাবধানে বেলা নয়টা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বিদ্যা চর্চা করে যে যার ঘরে ফিরে যেত এবং বিদ্যালয়ে গমনের প্রস্তুতিপর্ব সাঙ্গ করে বিদ্যালয়ে গমন করত।

এই বেবী আপুর আদ্য-প্রান্তে কিছু বিশেষণ যুক্ত ছিল। অনেকে উনাকে ডাকত " ফেলটু " আবার অনেকে ডাকত " ভেলুপচা"। সম্মুখে! ওরে বাপ্ রে....! ডাকলে কি আর রক্ষা আছে? তাঁর যে বিশাল সেনাবাহিনী সেনাপতীর অবমাননায় হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌বে তা কি ভাবা যায়? দৈবাৎ কখনো কেউ যদি নিতান্ত মনের ভুলে ডেকে বসত তবে তার উপর জারী হত গ্রেফতারী পরওয়ানা। গ্রেফতার শেষে রিমান্ডে নেবার ব্যাবস্থা হত। রিমান্ডে চড়-থাপ্পড়-কিল ঘুষি চলত। অপরাধ গুরুতর হলে কারাবাস অথাৎ দু' তিনদিন আর কথা বলতেন না এবং যত্নে গড়া সাধের স্থানে ও প্রবেশ করতে দিতেন না। তাই সকলে আড়ালেই এ বিশেষণের বিশেষত্ব অপরের কাছে তুলে ধরত। তাঁর নামের সাথে বিশেষণ দুটো ইচ্ছাকৃতভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি বা কেউ হেয়ালির বশে ও দেয়নি আর দিয়ে থাকলে ও তা আমাদের অজান্তে। তাঁকে এই বিশেষণে বিশেষত করার কারণে এই যে তিনি প্রতি শ্রেণীতে একবার দু' বার ফেল করে অনেক কষ্টে প্রাইমারী ডিঙিয়েছিলেন। অবশেষে কিছুতেই সেখানে টিকতে না পেরে পড়া-লেখায় ইতি টেনে স্ব-রচিত পাঠশালায় গুরুগিরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সে স্থানে প্রবেশের কতই না চেষ্টা করেছি! উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটাহাঁটি করেছি কিন্তু কোনদিন কেউ দরদ দিয়ে ডাকেনি, বরং বিরক্তিকর জীব মনে করে এ স্থানের বাসিন্দারা এমন ভাবে প্রকাশ

করেছে যে আমি যত দ্রুত স্থান ত্যাগ করি ততই মঙ্গল। কিন্তু অত্যান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর এ স্থানের বাসিন্দারা আমার পর নয়, একান্ত আপনজন। এমনভাবে আমাকে সকলেই গ্রহন করল যে মনে হল আমি কোন বিশেষ ব্যাক্তি আর আমাকে বিশেষ কোন "অ্যাওয়ার্ড" দিতে সকলেই প্রস্তুত হয়ে ছিল শুধু বিলম্ব আমারই, প্রতীক্ষার যেন অবসান ঘটল এমনিভাবে সকলেই অত্যান্ত আন্তরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করল।

ভাগ্য যার সু-প্রসন্ন তার ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন পড়বেনা তো কার ললাটে পড়বে! বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বেগ পেতে হল না আবার যে স্থানে প্রবেশ করার জন্য ইতিপূর্বে মনোনিত হইনি সে স্থানে ও প্রবেশ করতে এতবেশী কাঠ-খড় পোড়াতে হল না, একেই বলে সৌভাগ্য আর কি! তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় কি না কে জানে। বড়জোর পনের কি বিশ মিনিট পর ভোজনপর্বের সমাপ্তি ঘটল পূবেই উল্লেখ করেছি যে চিড়া-মুড়ীর স্বাদ একা একা খাপ ছাড়া লাগত তাই একজন সঙ্গী খুঁজতাম। মুলতঃ সে স্থানে আমার প্রবেশ ও ঐ একই কারণে। পড়তে যাওয়া ছুতো মাত্র! কাজ শেষে বৃথা সময় নষ্ট করার মত বোকা আমি নই। কিন্তু সমস্যা একটাই কোন কারণ ছাড়া কিভাবে বের হই? তাই একজন পাকা অভিনেতার মত এমন ভঙ্গিগমা করলাম যেন চিড়া-মুড়ি আমার উদরে পড়ে একসাথে আবদ্ধ হয়ে প্রস্তরীভুত শিলার আকার ধারণ করেছে। এখন তা সরাতে না পারলে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। জলপান অত্যান্ত আবশ্যক ভেবে মহামান্য রাণীর কাছে জলপানের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হল বটে কিন্তু দু' চারটি উপদেশবাণী মুখ হতে নিঃসৃত হবার পর। তাছাড়া পান্ডিত্য বলেও তো একটা কথা আছে। নিজেকে সু-পন্ডিত হিসেবে প্রকাশ করতে কে না চায়? তাই অত্যান্ত গভীর ভাব সম্পন্ন পান্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য সর্ব শিক্ষার্থীদের নয়নমনি বেবী আপু বলে উঠলেন – দেখ শুভ, কাজটা তুই ভাল করিস নি। – কোন কাজ আপু? – বুঝিস্ না কোন কাজ? গাধা কোথাকার...। গাধাই হই আর যাই হই এখন এ স্থান ত্যাগ করতে পারলেই বাঁচি। মা স্বরস্বতীর যদি কোন সদিচ্ছা হয় তবে তিনি বর দেবেন–এইখানে আর না ভেবে মাথা নীচু করে চুপ করে রইলাম। আমার নিরবতা দেখে তিনি পুণরায় বললেন– তুই চিড়া-মুড়ী এনেছিস্ কিন্তু খাবার পানি আনিস্ নি। তোর গলায় যদি বেধে যেত কি করতি? পানি আনতে আনতে তো মরেই যেতি। –আচ্ছা, এখন ছুটি...। – ঠিক আছে যা কিন্তু তাড়াতাড়ি আসিস্। আজ আর আসব না বলে দিলাম ভোঁ-দৌড়। তখন আমাকে আর পায় কে? শিকারীর হাত থেকে ছাড়া পাবার পর কোন হরিণ শাবক কি পুণরায় ধরা দেয়? শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম আব্বু-আম্মুর তখন ও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। হঠাৎ টিউবওয়েলে মনুষ্য পদধ্বনী শোনামাত্র চম্ কে উঠে সেদিকে তাকাতেই দেখি জাকির জানালা দিয়ে চোরের মত কি যেন তালাশ করছে।– জাকির! চম্ কে উঠে পেছনের পানে চেয়ে আঠাশপাটি হলুদাভ দন্ত বিকশিত করে একগাল মিষ্টি হাঁসি উপহার দিয়ে জাকির বলল- আমি জানি শুভ তোর কোন মতলব আছে তাই ছুটি নিয়ে চলে এলাম।– তোকে ছুটি দিল! – দিতে চায় না। তারপর বলেছি, আপু, আমার না খুব পেট ব্যাথা করছে। মনে হয় মরেই যাবো। – তারপর? – তারপর পাটির উপর টান হয়ে শুয়ে আ.....উ....চীৎকার শুরু করেছি। আমি কিন্তু কাঁদি নি- কাঁদার ভান

করেছি তারপর ও চোখ থেকে পানি বের হয়েছে। চোখের পানি দেখে বেবী আপু কি বলে জানিস্? – কি বলে?– নুন দিয়ে কষ্টা (কষযুক্ত) বড়ই পেট পুরে পুরে খাবি! পেট তো ব্যাথা করবেই– তারপর ছুটি দিয়ে দিল। আচ্ছা, শুভ বলতো তোর কি হয়েছে? – আমার না পড়তে একদম ভালো লাগেনা। আচ্ছা, জাকির বল্ তো, পড়া-লেখা কে বের করেছে? ঐ ব্যাটারে যদি একবার পাইতাম তবে নদীর জলে চুবিয়ে মার-তাম।– আমার মনে হয় মস্‌জিদের বড় হুজুর জানে। সারাক্ষণ শুধু বই নিয়ে পড়ে থাকে। আচ্ছা, বাদ দে সে-সব। তোকে একটি কথা বলি, জানিস্ , বুড়িটা না আজ নেই। – সত্যি! কি বলিস্ ? আজ ওর গাছের ডালিম খাবই খাব। – কিন্তু, আমার যে ভয় করে। কেউ যদি দেখে ফেলে। – তুই একটা আস্ত ভীরু, আমি যে গাছে চড়তে জানি না, নয়তো কি তোকে ডাকতাম? সেদিন ঐ গাছতলায় গিয়েছি বলে আমাকে লাঠি দিয়ে তাড়া দিয়েছে। – কি তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে! চল্ যাই , আজ দেখিয়ে দেব ঐ বেটি কি করে ধরে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

বুড়ীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে আমরা দু'টি প্রাণী অত্যান্ত সাবধানে এগুতে লাগলাম। নালার ধারে পৌঁছে থম্ কে দাড়ালাম। এটা পার হব কিভাবে? ওখানেই তো সমস্ত বিদ্যানুরাগীর দল মা স্বরস্বতীর আরাধণায় ব্যাস্ত। কিন্তু যেতে যে হবেই। না গেলে মনোবাসনা পূর্ণ হবেনা। দু'বন্ধু একত্রে হাত ধরে শুকনো নালার মাঝখান দিয়ে দিলাম কষে এক দৌড়। ভাগ্য সু-প্রসন্ন বলে কার ও দৃষ্টিতে পড়লাম না। অত্যান্ত নিরাপদেই কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছলাম।

প্রভাত পাখীর সংগীত তখনো পর্যন্ত থামেনি। মিষ্টি মধুর সুরের মূর্ছনায় সমস্ত বাড়ির আঙিনাটা মুখরিত। যেখানে ভয় নেই, মৃত্যুর আশংকা নেই, শিকারির বন্দুকের আওয়াজ নেই সেখানে যদি গানের সুর ভেসে না আসে তবে পৃথিবীর কোথায় সুরের ঝংকার উঠবে? বেসুরো মনুষ্য পদধ্বনী শোনামাত্র সমস্ত সুর প্রণেতাদের কণ্ঠের ধ্বনী একেবারে থেমে গেল। সম্মুখে দেখলাম দু' তিনটি নাম না জানা পাখি সামনের দিকে মাথা তুলে একটু চেয়েই ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল আর তার সংঙ্গে সংঙ্গে বৃক্ষরাজীর শাখায় ক্ষণকাল শুধু ডানা ঝাপটানির শব্দই কর্ণ গোচর হল। দু' জনেই মৌন ছিলাম। এবারে জাকির কথা বলে উঠল – শুভ, তুই কোথাও যাস্ নে। আমি গাছে চড়ি তুই নীচে দাড়িয়ে থাক। – আচ্ছা। কোনস্থানে স্থির পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমার অভ্যাস নয়। সমস্ত বাড়ির আঙিনাটা মন্দ নয়! কোথা থেকে একটি ফুলের মিষ্টি ঘ্রান আমার নাসারন্দ্রে প্রবেশ করে আমাকে অস্থির এবং অশান্ত করে তুলছে। ইতিপূর্বে এ বাড়ীর আঙিনায় বহুবার প্রবেশ করেছি কিন্তু এ বাড়ির প্রকৃতির চিত্র এমন মনোহর ভাবে ধরা দেয়নি। চারপাশটা ঘুরে দেখার বড্ড লোভ হল তাই এক পা দুই পা করে এগিয়ে গিয়ে জানালার পাশে হাজির হলাম। জানালাটা খোলা দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগল। তবে কি বুড়ী ফিরে এসেছে নাকি জাকির ভূল দেখেছে? পা টিপে টিপে জানালার একেবারে সম্মুখে গিয়ে ভেতরে উকিঁ মেরে দেখলাম শুন্য ঘর। মাটির তৈরি ঘরে মাটির তৈরি উঁচু খাটে কয়েকটি ছেঁড়া মলিন কাঁথা-বালিস বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো - ছিটানো। মাটির দেহ, মাটির ঘর, মাটির খাট এই ঘরটির অপূর্ব অর্ন্তমিল দেখে ভাবলাম বুড়ী সত্যিই বুদ্ধিমতি। তন্ময় হয়ে বাড়ীর

চারপাশটা ঘুরে দেখছি। ইতিমধ্যে কোথা হতে এই সাত-সকালে বুড়ী এ অভাবনীয় আগমনের কথা শুনে ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জাকির ধপ করে গাছ থেকে পড়ে গেল। ভাগ্যিস বেশিদূর উঠেনি তাই কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। ইতিমধ্যে বুড়ী তার কংকালসার হাত দিয়ে আমাকে ধরে ফেলেছে। বার্ধক্যের শক্তি আর তারন্যের উদীয়মান শক্তি কি এক? এক ধাক্কায় বুড়ীকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। পালালাম বটে কিন্তু চুরি যে করতে এসেছিলাম তার নমুনাস্বরূপ সাধের জুতো দু' পাটি ফেলে এলাম। বুড়ী ছাড়বেনা তা জানি। নিজেকে নিস্পাপ প্রমাণ করার জন্য দু'টি মিথ্যা বাক্যই যথেষ্ট ছিল তাও ভেস্তে গেল। জুতো জোড়া ফিরিয়ে আনতে পুণরায় যে সেখানে যাব তার সময়টুকু ও শেষ হয়ে গেছে কারণ বুড়ীর চীৎকার চেঁচামেচীতে যারা জেগে উঠেছিল তারা সেখানে পৌঁছে গেছে আর যারা জাগরিত হননি তাদেরও নিদ্রা ভেঙে গেছে এবং ক্ষণকাল পূর্বে যাদের সাথে জ্ঞান সাধনায় ব্যাস্ত ছিলাম তারাও এসে পৌঁছে গেছে এবং জুতো জোড়া সনাক্ত করে ফেলেছে। এরপর যা ঘটেছিল তা আর লিখে প্রকাশ করতে চাই না। সচেতন পাঠক মাত্রই হয়তো বুঝতে পারবেন। শুধু এটুকু বলব যে দীর্ঘদিন দু'টি হৃদয় আর একত্রিত হতে পারেনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটল এবং সেই সাথে আমার সদস্যপদ ও বাতিল হয়ে গেল। পড়ার স্থানে প্রবেশ করার সমস্ত যোগ্যতা হারিয়ে একেবারে মুষড়ে পড়লাম। মনে হতে লাগল সমস্ত পৃথিবী আজ আমার পর। সমস্ত পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ যখন একেবারে বিছিন্ন হয়ে গেল তখন পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির ন্যায় ছটফট করতে করতে একেবারে নিরানন্দ জীবন–যাপন করতে লাগলাম। শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে পুণরায় মিলিত হবার সমস্ত শক্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। বুড়ীর প্রতি প্রচন্ড জিদ হল আবার নিজের বোকামির জন্য নিজেকে ও তিরষ্কার করতে লাগলাম। যদি জুতো না পরতাম অথবা পরলামই কিন্তু পালানোর সময় কেন তা সঙ্গে আনলামনা। এতদসত্বেও বুড়ীকেই বেশী দোষারোপ করতে লাগলাম। স্থির করলাম পুণরায় যদি দু'জন একত্রিত হতে পারি তবে ঐ গাছ আর রাখব না। কত যে পরিকল্পনা করলাম গাছ কেটে ফেলব! আবার এও ভাবলাম গাছ যদি সত্যি সত্যিই কাটি তবে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি। শুনেছি টগবগে গরম পানি গাছের গোড়ায় ঢেলে দিলে গাছ আপনা-আপনিই মরে যায়। এমনি কত আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে করতে একেবারে নিরানন্দ জীবন যাপন করতে রাগলাম। একদিন অভ্যাসমত সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। কোন উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই। নিজে যে একজন অপরাধী তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। বাড়ির বাইরে যাব সে সাহস নেই। বার বার মনের মাঝে ভেসে উঠে সেজ ভাইয়ের রক্তচক্ষু আর সেই ভয়ংকর বাণী– আর একবার বাইরে বেরিয়েছিস্ তো পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব।

নিজের একান্ত শক্তি বলে শৃংখল ছিন্ন করার সাধ্যটুকু যেহেতু নেই সেহেতু শৃংখলাবদ্ধ জীবন কাম্য না হলেত গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ একথা সর্বজনস্বীকৃত আমার ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম ঘটবে কেন? কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকেনা। প্রবহমান জীবনে কোন না কোন কর্মে ব্যাস্ত থেকে

ব্যার্থতাকে দায় না করে বেঁচে থাকতে হয়। সেই যে টমকে নিয়ে এসেছি আর তার খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। আজ যখন নিজে বন্দি তখন বন্দিত্বের কষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। ধীরে ধীরে বারান্দার দিকে অগ্রসর য়ে দেখলাম টম তখন ও ঘুমিয়ে। ওকে বিরক্ত করব না ভেবে ফিরে আসছিলাম কিন্তু তাও সম্ভব হলনা। ইতিমধ্যে ও জেগে উঠেছে আর আমাকে দেখে ক্যা.....ক্যা...ধবনী কণ্ঠে ধারণ করে লাফালাফি করছে। আমি একলাফে টমের সম্মুখে গিয়ে হাজির হলাম। আমার লম্ফযোগে কিছুটা ভীত হয়ে পিছিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে ঘাড়টাকে বাঁকা করে পুণরায় ক্যাঁ....ক্যাঁ.... ধবণী উচ্চারণ করতে লাগল। টমের গলা হতে শৃংখলার রশি খুলে দিয়ে বললাম–" টম তুই যা তোর সাথীদের কাছে"ও বুঝল কিনা জানিনা তবে দেখলাম ছোট ছোট দুটি চোখমেলে আমার পানে চেয়ে আছে। সেখানে আর কোন দেরি না করে গুটি গুটি পায়ে বারান্দা হতে নেমে এলাম। টম ও আমার সাথে সাথে ছন্দময় পায়ে নৃত্যময় ভঙ্গিতে নেমে এল। তা দেখে আমার মনে আনন্দের লহর বয়ে যেতে লাগল। ভাবলাম টমের সাথে একটু খেলা যাক্। আমি যে ছালার টুকরো রশি দিয়ে বেঁধে বল বানিয়েছিলাম অবসরমত খেলার জন্য তা বের করে আনার জন্য নিজের ঘরে ঢুকলাম। আমার পিছু পিছু টমও আসতে ছাড়েনি। বলটি খুঁজে বের করে সামনে ফেলে দিয়ে বললাম " টম বলটা নিয়ে আয় দেখি"। অত্যান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রভুর আদেশ পেয়ে টম প্রথমে বলটার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর শারীরিক কষরত শেষে বলটিকে কামড়ে ধরে সামনে নিয়ে এল কিন্তু মাটিতে ফেলল না। আমি হাত প্রসারিত করে সামনে ধরা মাত্র পুণরায় বলটি মুখে নিয়ে দিল এক ভোঁ-দৌড়। "টম ফিরে আয় বলছি" বাক্যটি শোনামাত্র কিছুটা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পুণরায় বলটি ফেলে দিয়ে আবারও শারীরিক কষরত শেষ করে বলটি কামড় দিয়ে ধরে আমার সামনে এনে ফেলে দিল। আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। আমার টম সব বোঝে! অথচ এতটা দিন আমি টমের কাছ থেকে দুরে সরে ছিলাম। অন্তপুরে এত ঘনিষ্ট বন্ধু এতবড় খেলার সাথী বন্দি করে রেখে বর্হিপানে উম্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছিলাম একথা ভেবে নিজেই নিজেকে বোকা ভাবলাম আর গৃহবন্দি হবার সুবাদে নতুন খেলার সাথীকে আবিষ্কার করতে পেরে মহামান্য হাকিম আমার সেজ ভাইয়াকে অসংখ্যা ধন্যবাদ দিলাম।

আমার সাথে টমের সখ্যতা অল্পদিনেই বেশ জমে উঠল। টম যেন আমাকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না আর আমিও তাই। আরও দেখেছি আমাদের বাড়ীতে আগন্তুক এলে টমের চীৎকারে সমস্ত বাড়িতে এক ভীতিময় পরিবেশ সৃষ্টি হত। নতুন অতিথি ভয়ে ভীত হয়ে পালাবার উপক্রম করলে বাড়ির কোন সদস্য সেখানে প্রবেশ করামাত্র টম পায়ের ওপর টীপ করে পড়ে যেত। পথ ছেড়ে দিতে আদেশ করামাত্র দূরে দাঁড়িয়ে লেজটাকে বাঁকা করে অতিথীকে অভ্যর্থনা জানাত। হত বিহ্বলের ন্যায় চেয়ে থেকে টমের প্রশংসা করা ছাড়া আর কোন গতি থাকতনা। টমের কেউ প্রশংসা করলে গর্বে আমার আধা ইঞ্চি বুকের ছাতি ফুলে এক ইঞ্চি আকার ধারণ করত আর ভাবতাম ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে টমকে এনে ভুল করিনি। এমনি করে অনেকটা দিন পার হল। টম আর আমি আর গৃহবন্দি নই। নিয়মিত স্কুলে গমন এবং বাহারী রকমের খেলাধূলায় ব্যাস্ত থেকে হায়াতের রশি দিনে দিনে কেটে দিচ্ছি। টম ও এখন বেশ বড়

হয়েছে। টমের কল্যানে সমস্ত পাড়ামহলে আমি এক গর্বিত নাম। আমার স্ব-জাতীর কাছে অর্থাৎ বন্ধুমহলে ঈর্ষার কারণ ও আমি। আর আমার টম? ভাগ্যিস টমের স্ব-জাতীরা ওকে হিংসা করত না। যদি করত তবে আর ওকে বাঁচাতে পারতাম না। টমের স্ব-জাতীরা হিংসা করবেই বা কেন? টমের জন্মই তো হয়েছে রাজা হবার জন্য। একটি রাজ্যে প্রধান রাজা তো একটিই থাকে আর যা থাকে তা উপরাজা, সাঙ্গোপাঙ্গো এবং জনগণ। সাঙ্গোপাঙ্গে দের কাজ রাজার মনোরঞ্জন করা। আমি যখন কোন কারণে বাইরে বেরুতাম টম ও আমার সাথে যেতে ছাড়তনা। আমি চেয়ে দেখতাম প্রতিবেশী বাড়ীর সমস্ত কুকুর গুলো টমকে রাজা মেনে বশ্যতা স্বীকার করত। টমও দৃশ্যটা বেশ ভালই উপভোগ করত। তাই যখন এমন ঘটনা ঘটত তখন আমার দিকে এবং অপর বাড়ীর কুকুরের দিকে চাইতে চাইতে পথ অতিক্রম করত। তাদের দু' একটা অবশ্য রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হত এবং ঘেউ ঘেউ চীৎকার শুরু করে দিত কিন্তু টম সেগুলোকে পাত্তা দিত না। অত্যান্ত কঠোর শাসনের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের শাসন করত। এ গেল টমের খ্যাতির কথা। টম অখ্যাতি ও কম নয়। দোষ এবং গুণের সমন্বয়েই প্রাণী/উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচিত। গুণের সংখ্যা সর্বাধিক হলে উপকারী আর দোষের সংখ্যা সর্বাধিক জীবানু। আমার টম অবশ্য জীবানুর পর্যায়ে পড়েনি তবে ওর অপকারীতা নেহাৎ কম নয়। টমের অখ্যাতি হল অবাধ্যতা। সর্বদা ও আমার পিছনে লেগে থাকত। ওর এহেন আচরণে মাঝে মাঝে আমার বেশ বিরক্ত লাগত।হয়তো আমি স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন দেখব টম বাইরে দাঁড়িয়ে ঘেই ঘেই চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।আমি বের হওয়া মাত্র পায়ের শুয়ে আর উঠতে চাইত না। যেন আমি স্কুলে না গেলেই ও খুশী। আমার তো আর থেমে থাকলে চলবে না। আমার জিদের কাছে যখন পরাজিত হত তখন অন্যকোন উপায় না দেখে পিছু পিছু এসে গ্রামের শেষ মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিত। তারপর ফেরার সময় সামনে কিছুটা দৌড়ে এসে আবার পেছনের পানে চেয়ে দেখত যেন একমুহুর্ত ও আমাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। এমনি সু-সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব যে বিশ্ব বিধাতার ইশারায় একেবারে শেষ হয়ে যাবে তা কখনও ভাবতে পারি নি।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ ঃ

সময়টা সম্ভবত শ্রাবনের মাঝামাঝি। বন্যার পানিতে সমস্ত মাঠ-ঘাট প্লাবিত হয়ে গেছে। চৈত্রে ফাটল ধরা মাঠের বুকে যে সমস্ত গুহাবাসী প্রাণী আশ্রয় নিয়েছিল সে সমস্ত প্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করে ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছে। বিষাক্ত গোখরা সাপের তান্ডবলীলা এমনভাবে শুরু হয়েছে যেন তারা তাদের বিষাক্ত দংশনে সমস্ত মানবজাতীকে ধবংস করে দিতে চায়। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকজনকে অবশ্য কবরে পাঠিয়েছে। ওঝাদের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন বাড়ীতে ছুটে যেতে হয়, গেলে কি হবে? বেশির ভাগই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এদের বিরুদ্ধে কিছু করাও যায়না। সমস্ত দিন কোথায় যেন লুকিঁয়ে থাকে কিন্তু শ্রাবনের প্রচন্ড বারিধারার কারণে রাত্রিকালে আর লুকোনো স্থানে কিছুতেই টিকতে না পেরে মানুষ যে সমস্ত স্থানে মাথা গুজে বাস করছে সে সমস্ত স্থানে প্রবেশের চেষ্টা করত। বাধা পেলেই সাঁ করে মেরে দিত ছোবল।

সেদিন বিকেল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সন্ধ্যানাগাদ চারিদিকটা ঘন আঁধারে ঢেকে গেল। শ্রাবনের বারিধারা যেন থামতেই চায়না। আমাদের বাড়ীতে ছিল মোট তিনটি ঘর। তারমধ্যে দু'টো ছাপড়া এবং একটি ছনের ছাদ এবং শনের বেড়া দেওয়া। আব্বা-আম্মাসহ আমি থাকতাম ছনের ঘরে। শনের বেড়া বৃষ্টির ঝাপটায় পঁচে গেছে আর মাঝে মাঝে খসে পড়েছে। কি মনে করে আম্মা আর আমি সেদিন ঘরের মেজেতে দরজার প্রায় সামনে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলাম। সামনে বারান্দা আছে বলে বৃষ্টির জল এ স্থানে প্রবেশ করতনা। আব্বা দোকান থেকে তখনও ফেরেনি বলে আম্মা দরজাটা খোলাই রেখেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম বড্ড ঘুম কাতুরে। তাছাড়া শ্রাবনের বৃষ্টির ছন্দময় সংগীতে খুব দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল চীৎকার-চেঁচামেচীতে। চোখ ডলতে ডলতে বারান্দা থেকে নেমে এসে দেখি উঠোনে রশির মত টান হয়ে পড়ে আছে তিন-চার হাত লম্বা একটি বিষাক্ত গোখরা সাপ। আমি ভয়ে আর সামনে এগুতে পারলাম না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেই শুনতে লাগলাম ঘটে যাওয়া কাহিনী। শুনতে পেলাম প্রতিবেশী ওদুদ ভাই বলে যাচ্ছেন। – আমি মাছ ধরার জন্য এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি কুকুরের করুন চীৎকার শুনে টচ মেরে দেখি দু'টো সাপ ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে কিন্তু কুকুরটি বাধা দিচ্ছে। সাপ দু'টি যতই প্রবেশ করার চেষ্টা করে কুকুরটি ততই বাধা দেয়। অন্য কোন উপায় না দেখে সাপ দু'টি ছোবলের পর ছোবল মারে কিন্তু কুকুরটি অনড়। হাতে যে লাঠিটা ছিল তা দিয়ে পিটিয়ে একটিকে মেরে ফেলেছি, অন্যটি পালিয়েছে। ওদুদ ভাই কথা শেষ করা মাত্র আমি চীৎকার করে উঠলাম – আমার টম! টম কোথায়?

হাতে টচ নিয়ে বৃষ্টি ভেজা রাতেই সমস্ত পাড়া খুঁজে বেড়ালাম কিন্তু কোথাও টমকে খুঁজে পেলাম না। ক্লান্তদেহ নিয়ে ঘরে ফিরে পুণরায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম এল না। অশুভ আশংকায় সারা মনে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হল। এমনি করে প্রভাতের আলো ফুটে উঠল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবারও খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম আমার সেই নিষিদ্ধ স্থানে টম মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। সারা শরীরে অসংখ্যা কালচে ক্ষতচিহ্ন। অপলক চোখ মেলে টম যেন বলতে চাচ্ছে "বন্ধু বন্ধুত্বের জন্য এই আত্মাদান কোনদিন ভুল না"।

টমকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। এতকাল পরে এসেও টমের স্ব-জাতীয় কাউকে একান্ত নিকটে দেখলেই আমার হৃদয় আকাশে ভেসে উঠে টমের নিরব-নিথর দেহখানি আর ভাবি যে কাজ বিশ্ব-স্রষ্টার শ্রেষ্ট সৃষ্টি করতে দ্বিধাবোধ করে সেই কাজ টম করে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এমন আত্মত্যাগী সু-বন্ধুকে কি ভোলা যায়? কখ্ খোন ও না।

খঃ মঃ আবদুল গনি, নাটোর